বিধবা ও পরিত্যক্তা নারীর সামাজিক অবস্থান: একটি সমীক্ষা

জাকির হোসেন
মৌসুমী শারমিন

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

বিধবা ও পরিত্যক্তা নারীর সামাজিক অবস্থান: একটি সমীক্ষা

জাকির হোসেন
মৌসুমী শারমিন

ওয়ার্কিং পেপার নং-৪

এপ্রিল ২০০২

বিধবা ও পরিত্যক্তা নারীর সামাজিক অবস্থানঃ একটি সমীক্ষা

জাকির হোসেন [১]
মৌসুমী শারমিন [২]

নাগরিক উদ্যোগ 'নারীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন'-এর জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে কাজ করে আসছে। পরিত্যক্তা ও বিধবা নারীই হলো সবচাইতে দুঃস্থ ও দরিদ্র। এই দরিদ্র নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা নেওয়ার জন্য এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়। এই সমীক্ষার জন্য নাগরিক উদ্যোগ-এর মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই কাজটির জন্য কোন অর্থ বরাদ্ধ না থাকায় বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ে আমাদের আরো কাজ করার ইচ্ছা আছে এবং এর ভিত্তিতে এই দুঃস্থ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করার পরিকল্পনাও আমাদের আছে। এই সমীক্ষার সাথে যুক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

১. জাকির হোসেন, সমন্বয়কারী, নাগরিক উদ্যোগ
২. মৌসুমী শারমিন, গবেষণা কর্মকর্তা, নাগরিক উদ্যোগ

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ..... i-iii

প্রথম ভাগঃ বিধবা নারী ১-১৩

১. ভূমিকা
২. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি
৩. উত্তরদাতার বয়স
৪. বৈধব্যের সময়কাল
৫. বিধবা হওয়ার সময় বয়স
৬. বিধবা নারীর সন্তান
৭. বিধবা হওয়ার পর স্বামীর পরিবার থেকে সহায়তা প্রাপ্তির নমুনা
৮. পিতার পরিবার থেকে সহায়তা প্রাপ্তির নমুনা
৯. স্বামীর পরিবারের জমি-জমার বিবরণ এবং উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা
১০. পিতার পরিবারের জমিজমার বিবরণ
১১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিধবা নারীর জন্য সহযোগিতা
১২. বর্তমান উপার্জন ভরণপোষণের ধরণ
১৩. বর্তমান বাসস্থান
১৪. উপসংহার

দ্বিতীয় ভাগঃ পরিত্যক্তা নারী..... ১৪-২৪

১. ভূমিকা
২. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি
৩. উত্তরদাতাদের বয়স
৪. পরিত্যক্তা হয়ে থাকার সময়কাল
৫. বর্তমানে স্বামীর সাহায্য সহযোগিতার ধরন
৬. পরিত্যক্তা নারীদের সন্তান
৭. ছেলেমেয়েদের বর্তমান আশ্রয়স্থল
৮. পরিত্যক্তা নারীদের বর্তমান আশ্রয়স্থল
৯. স্বামীর এধরণের আচরণের পিছনের কারণ
১০. পরিত্যক্তা নারীরা স্বামীদের এ ধরনের অপরাধে ধরনের বিচার চান
১১. যাদের কাছে প্রতিকার চেয়েছিলেন
১২. উপসংহার

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

নাগরিক উদ্যোগ এপ্রিল-মে, ১৯৯৯ সময়কালে কয়েকটি কর্মএলাকা টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গা, কালিহাতী, বল্লা ইউনিয়নে এবং রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার দামোদরপুর ইউনিয়নে ৮৬ জন বিধবা নারী এবং ৮৩ জন স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে আলাদাভাবে এই সমীক্ষার আওতায় এনে দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও লিঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে তাদের সামগ্রিক অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরার প্রায়াস নিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের শিকার ও লিঙ্গীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন এই নারীদের জীবন-সংগ্রাম ও তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে এই সমীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমীক্ষার পরিধি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হলেও সামগ্রিকভাবে একটি মূল্যায়ন করার সুযোগ এখানে রয়েছে। কারণ মাত্র দু'টি জেলায় ৪টি ইউনিয়নে গবেষণাটি পরিচালিত হলেও সমগ্র দেশের বিধবা ও পরিত্যক্তা নারীর অবস্থা ও অসহায়ত্বের চিত্র স্পষ্ট করার মতো ভিত্তি এ গবেষণাটিতে রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সামজিক বিধি ব্যবস্থা কিভাবে এই বিধবা বা পরিত্যক্তা নারীকে অসহায়ত্বের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে, এমনকি রাষ্ট্রীয় আইন পর্যন্ত একই কারণে কিভাবে এইসব দু:স্থ নারীদের পাশ কাটিয়ে যায়, সহায়তার বদলে দুর্বোধ্যতার মারপ্যাঁচ দিয়ে আরো নিঃস্ব করে ফেলে তার চিত্রটি স্পষ্ট করা এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় পুরুষের ওপর নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার প্রভাব তুলে ধরা এবং এই নির্ভরতার কারনেই বিধবা বা পরিত্যক্তা হবার পর তাদের অবর্ণনীয় দুঃস্থতার চিত্র পরিস্ফুট করাও এ গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া, কিভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করা যায় তা চিন্তা করার প্রয়াস নেওয়া।

গবেষণা পদ্ধতি

বিধবা ও পরিত্যক্তা নারীদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের ওপর ভিত্তি করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল এ গবেষণার মূল পদ্ধতি। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিধবা বা পরিত্যক্তা নারীদের বর্তমান বয়স, বিধবা বা পরিত্যক্তা হবার বয়স, দাম্পত্য সময়কাল, বিধবা বা পরিত্যক্তা হবার কারণ, বর্তমান অবস্থান, আয় বা অর্থণৈতিক অবস্থা, সন্তানের সংখ্যা, স্বামীর পরিবার থেকে সহযোগিতার ধরন, পিতার পরিবার থেকে সহযোগিতার ধরন ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রিক প্রশ্ন সন্নিবেশিত করে উক্ত কর্ম এলাকার ৮৬ জন বিধবা নারী এবং ৮৩ জন পরিত্যক্তা নারীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। নাগরিক উদ্যোগ-এর মাঠকর্মীরা এই তথ্য সংগ্রহ করে।

বিধবা ও পরিত্যক্তা নারী

স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে বিধবা বলা হয়। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় 'বিধবা' শব্দটির সঙ্গে হাজারটি বিধি নিষেধ জড়িত। শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র সেই নারীর পোষাক থেকে শুরু করে বর্ণহীন যে জীবনাচরণের চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তা থেকেই বোঝা যায় একজন বিধবা নারী কতোখানি অসহায়। গবেষণায় বিধবা হওয়ার বয়সের যে ছক করা হয়েছে সেখানে দেখা যাবে বেশিরভাগ নারী খুবই অল্প বয়সে বিধবা হয়ে শিশু সন্তান নিয়ে চরম অসহায় জীবন যাপন করছেন। বিধবা হবার কারন খুঁজতে গিয়ে

দেখা যায়, স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর অনেক বেশি বয়স, চরম দারিদ্র, চিকিৎসার অভাব আর সামাগ্রিকভাবে অস্বাভাবিক মুত্যুই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটেছে। মানুষের মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু একজন মানুষের মৃত্যুতে অন্য একজন মানুষের মৃত্যুর চেয়েও বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে পতিত হওয়ার মতো যে সমাজব্যবস্থা তার কারণেই একজন বিধবাকে চরম অসহায়ত্বের মধ্যে নিপতিত হতে হয়।

স্বামী পরিত্যক্তা নারী বলতে এমন নারীদের বোঝানো হয়েছে যাদের স্বামী তালাক না দিয়েই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, স্ত্রীর প্রতি অথবা স্বামী কোন দায়িত্ব পালন না করে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত আছে। এই গবেষণায় এই নারীদের প্রতি সমাজের আচরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় পরিত্যক্ত, ফেলে দেওয়া বস্তুর মতই সমাজ তাদের দেখে থাকে। এই পরিত্যক্তা নারীদের অনেকেই জীবনের শুরু হতে না হতেই স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছেন। এই গবেষণায় ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সী ২১.৭৯% পরিত্যক্তা নারী তারই প্রমান। স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ক্ষেত্রে যে কারন দেখা গেছে, তা হলো স্বামী বিদেশ বা অন্য কোনো জায়গায় কাজের জন্য গিয়ে আর খোঁজখবর নেয়না বা টাকা পয়সা পাঠায় না, স্বামী হয়তো অন্য কোথাও আরেকটা বিবাহ করেছে এবং খবর পাঠিয়ে দিয়েছে সে আর আসবে না। যৌতুক না পেয়ে বা ঝগড়াঝাটি করে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে মারধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আর কোনদিন আসতে বারন করে দিয়েছে এবং পরবর্তীতে সে আবার বিয়ে করেছে, স্বামী হয়তো বেহেড মাতাল অথবা পাগল হয়ে গেছে-সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী নিজেই বাপের বাড়ি চলে গেছে, ইত্যাদি সব কারনে নারীদের পরিত্যক্তা হতে হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ পরিত্যাগের ঘটনা ঘটেছে ৫০.৬১% বহুবিবাহের কারনে।

বিধবা ও পরিত্যক্তা নারীদের স্বামী এবং পিতার পরিবার থেকে সহযোগিতার ধরন

একজন নারীর কাছে 'স্বামীর সংসার' বলতে আলাদা কিছু থাকে না। সেটা বস্তুত তার নিজের সংসার। এই নিজের সংসারে সে শ্রম দেন নি:স্বার্থ ভাবে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর প্রায়শই দেখা যায়, সেই নারী সেখানে পর হয়ে যায়। 'নিজের সংসার' কথাটার স্থায়িত্ব থাকে না। 'নিজের সংসার' কথাটার স্থায়িত্ব টিকে থাকলে সেখান থেকে সহযোগিতার কোন প্রশ্ন আসতো না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে বেশিরভাগ নারীর সম্পর্ক শ্বশুর বাড়ি থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর যখন একজন নারীর দূরাবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য শ্বশুরবাড়ির সহায়তার প্রয়োজন হয় সে সময়ে স্বামীর পরিবার থেকে ৫৬.৯৮%-ই কোন সহযোগিতা পায়নি।

পিতার পরিবারের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারনে সেই পরিবার থেকেও বিধবাদের ৬৬.২৮% কোন সহযোগিতা পায়নি। বিধবা নারীরা বলেছেন পিতার পরিবার থেকে সাহায্য করার ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্যের অভাবে তাদের পক্ষে পাশে দাড়ানো সম্ভব হয়নি।

পরিত্যক্তা নারীদের স্বামী বা স্বামীর পরিবার থেকে সাহায্য সহযোগিতার অবস্থা অত্যন্ত করুন। পরিত্যক্তা নারীরা বলেছেন স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসার সময় কোন ধরনের অর্থ বা সম্পদ তারা পাননি। বর্তমানে স্বামী কোন সাহায্য সহযোগিতা করে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ১০০ ভাগ পরিত্যক্তা নারীই জানিয়েছেন তাদের আক্ষেপের কথা যে, কোন ধরণের সহযোগিতর তারা পাননা। এমনকি এই পরিত্যক্তা নারীদের যে সন্তান সন্ততি আছে তার মধ্যে হাতে গোনা দুই একটি সন্তান ব্যতীত কেউই পিতার থেকে কোন ধরণের ভরণপোষণও পাচ্ছে না। ফলে পরিত্যক্তা নারীদের ৪৪.৬% কে বাবার বাড়িতে, ১০.৯% কে ভাইয়ের আশ্রয়ে সন্তান সন্ততিসহ চলে আসতে হয়েছে।

সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা

বিধবা নারীদের ৪০.৭০% এরই স্বামীর জমি-জমা রয়েছে। কিন্তু বিধবা নারী এবং তার সন্তানদের মধ্যে মাত্র ২৫.৭১% সে সম্পত্তি ভোগ করতে পারছে। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর বাড়ির সাথে বিধবা নারীর সম্পর্ক দূরবর্তী হয়ে

যাওয়ার কারনে স্বামীর সম্পত্তি অধিকাংশ নারীরই আর পাওয়া হয়ে ওঠে না। অনেক ক্ষেত্রেই বিধবা নারীরা যেহেতু পিতা বা ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকে সেহেতু পিতা বা ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে, ভবিষ্যতে আরো বিপদে পড়লে ভাইয়ের বাড়িতে পূনরায় নাও পাওয়া যেতে পারে। এরকম দু:শ্চিন্তার কারণে অনেক নারীর পক্ষেই পিতার সম্পত্তি দাবী করতে চায় না। ফলে ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিধবা নারীদের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবে অধিকাংশ বিধবা নারীকে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হতে হয়।

সামাজিক ন্যায়বিচার

সংসার করতে চেয়েও পরিত্যক্তা মহিলারা তা পারেননি। স্বামীর দ্বারা তাদের পরিত্যক্তা হতে হয়েছে। স্বামীদের এ ধরণের অন্যায় আচরণে এই পরিত্যক্তা নারীদের ক্ষোভ অনেক। তাই স্বামীদের বিরুদ্ধে আইনের সাহায্যে সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার কথা বলেছেন ৭৮.৩% নারী। বহু বিবাহের জন্য মামলা করার কথাও বলেছেন ১৪.৫%। স্বামীদের এ ধরনের অন্যায় আচরনে কিভাবে প্রতিবাদ করা উচিত, কি বিচার পাওয়া উচিত ৭.২% পরিত্যক্তা নারীই তা জানেন না।

উপসংহার

এই গবেষণায় প্রতিয়মান, 'পরিত্যক্তা' পরিচয়টা থাকার কারনেই এই নারীরা পেশাজীবী হলেও সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছেন না। বাবা বা ভাইয়ের সংসারে আশ্রিতা হিসেবে তারা বেঁচে আছেন। এই নারীরা শেষ পর্যন্ত না পায় পিতার সম্পত্তির ভাগ, সন্তানেরা না হয় পিতার সম্পত্তির সামান্য অংশিদার। এরা অনেকটা ভাসমান তৃণের মতো জীবনের বাকী অংশ কাটিয়ে দেন।

স্বামীর মৃত্যুতে কোন নারীর ঘরছাড়া হওয়াটা, ঠিকানাহীন, আশ্রয় বা অবলম্বনহীন হয়ে পড়াটা ঠিক স্বাভাবিক নয় কিন্তু বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আমাদের সমজে অহরহ ঘটে। একেতো সেই নারী ঠিকানা বা অবলম্বনহীন হয়ে পড়েন উপরন্তু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত নারীটিকে আরোও ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করতে তাকেই প্রায়শ: পুরো ব্যাপারটার জন্য দায়ী করে বসে। স্বামীর মৃত্যুটাকে শুধু নারীর দূর্ভাগ্য হিসেবে দেখেই 'সমাজ' ক্ষান্ত হয় না, 'স্বামী খেকো' 'রাক্ষসী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে নারীকে অপরাধী বানানো হয়। কারন হলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আয়-উপার্জনে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য। নারীর কর্মসংস্থানের সামাজিকীকরণ না হলে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটানো দুরুহ।

বিধবা এবং পরিত্যক্তা নারীদের দুঃস্থতা দূরীকরণে করণীয়

- ❑ নারীদের উন্নয়নে কাজ করছে এমন বিভিন্ন নারী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, আইনী সহায়তা দানকারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন সমূহের মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❑ পিতামাতা এবং স্বামীর সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা;
- ❑ মুসলিম পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- ❑ পরিত্যক্তা নারীদের ক্ষেত্রে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসা অথবা তালাক হলে ন্যায্য পাওনা আদায় করা;
- ❑ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং কর্মস্থলে অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- ❑ রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহ- কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিএফ কার্ড, খাস জমি ইত্যাদি কর্মসূচিতে দুঃস্থ নারীদের অংশগ্রহণ/ সেবা নিশ্চিত করা;
- ❑ দুঃস্থ নারীদের সন্তানের শিক্ষা, মানসিক বিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

- ❑ সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী/ বেসরকারী সংস্থা, প্রচার মাধ্যম, সংবাদপত্র, প্রাসঙ্গিক সেমিনার, পোষ্টার, লিফলেট, প্রামাণ্য চিত্র, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করা ।

প্রথম ভাগঃ বিধবা নারী

১. ভূমিকা

আমাদের দেশে নারীরা সাধারণত: পরিবারের আয় উপার্জনে অংশগ্রহণ করেন না ।এই দায়িত্ব বা ক্ষমতাটি থাকে পুরুষের থাকে । এ ধারাটিই এখন পর্যন্ত চলে আসছে । আবার নারীরা যে পরিবারে শ্রম দেন না তাও নয়, তবে সেই শ্রম উপার্জনমুখী না, সেগুলো বেশীরভাগই ঘর গৃহস্থলী রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশুনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এই শ্রমের কোন অর্থনৈতিক মূল্য নেই । সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবেই এ ব্যবস্থা আমাদের সমাজে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে বলে নারীরা এখন আর উপার্জনমুখী কোনো কাজের জন্য শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন না, প্রস্তুতি গ্রহণ করেন না । এমনকি শিক্ষা গ্রহণ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ দেখা যায় না । শেষ পর্যন্ততাকে সংসার দেখাশোনাতেই বা সন্তান লালন-পালন ও রান্নাবান্নাতেই মনোনিবেশ করতে হয় । শহর কি গ্রামে, ধনী কি দরিদ্র পরিবারে ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণভাবে এই চিত্রটিই প্রতিষ্ঠিত । ফলশ্রুতিতে দেখা যায় স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী খুব বেশী হলে শোকাভিভূত হন কিন্তু স্বামীর মৃত্যু ঘটলে একজন স্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়েন । কারণ স্বামীই তার ভরণপোষণকারী, আশ্রয়দাতা সমস্ত কিছু । এই ধারণাও দর্শন থেকেই বাংলা ভাষায়'বিধবা' বা 'সধবা' শব্দ দুটির উৎপত্তি । বিধবা মানে সেই নারী যার ভরণপোষণকারী প্রভূ বা কর্তা গত হয়েছেন এবং সধবা মানে সেই নারী যার ভরণপোষণকারী প্রভু বা কর্তা বর্তমান । 'ধব' শব্দের অর্থ প্রভু বা কর্তা ।

নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি গ্রন্থে আয়েশা বানু নারী প্রধান খানা : দারিদ্র বনাম সচ্ছলতা কতিপয় সূচক নির্ণয় প্রবন্ধে অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত,পরিত্যক্তা বা বিধবা পরিচালিত খানা সমূহকে আইনত নারী প্রধান খানা হিসেবে উল্লেখ করে বিধবা নারীদের নাজুকতা সম্পর্কে বলেছেন 'সামাজিক প্রচলিত ধারার কারণেই অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে হতে দেখা যায় তাদের চেয়ে দ্বিগুণ বা অনেক বেশী বয়সী পুরুষদের সাথে । এর স্বাভাবিক পরিণতি হল বিপত্নীক পুরুষের তুলনায় বিধবাদের সংখ্যাধিক্য । এই সব নরীরা বেশীর ভাগই বাস্তবের নানা প্রতিকূলতার সাথে একই লড়াই করতে বাধ্য হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেসব নারী এক সময়ে সুরক্ষিত নির্ভরশীল জীবন যাপন করেছে তাদেরকে হঠাৎ করে এমন এক পরিস্থিতিতে একা মাঠে নামতে হচ্ছে, যেখানে টিকে থাকার মত কোন হাতিয়ার তার নেই । যে সমাজে শিক্ষা, সম্পদ, জমি বা ঋণে নারীর স্বাভাবিক অধিকার নেই সেখানে তার পক্ষে অধিক সুবিধা ভোগী পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলা নি:সন্দেহে দুরূহ ব্যাপার । অধিকাংশ গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারী প্রধান খানাগুলোর আয় কম কেননা শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয় । শিশু পালনের বোঝা এককভাবে বহন করার কারণে বাড়তি খরচের পাশাপাশি তার জন্য কাজের গন্ডিও সীমিত হয়ে আসে । সন্তান দেখাশোনার প্রয়োজন থেকেই বাড়ীর আশেপাশে কম মজুরীর অনিয়মিত কাজে নিয়োজিত হতে হয় । অন্যদিকে কর্মজীবি মায়ের বিকল্প হিসেবে ঘরের মেয়ে শিশুটিকে নিয়োজিত হতে দেখা যায় গৃহস্থলী ও ছোট ভাই বোনদের দেখা শোনার কাজে । এরই অনিবার্য পরিণতি শিক্ষা-বঞ্চিত অধিকারবিহীন দারিদ্র চক্রের শিকার নারী ।'

যে নারীটি স্বামীর সংসারে লক্ষ্মী হিসেবে থাকতেন, সমস্ত সংসার আগলে রাখতেন,স্বামীর মৃত্যুতে সেই নারীই প্রথমত: হয়ে পড়েন আশ্রয়হীন, উপার্জনহীন । তাকে অন্য কোন পুরুষের উপর হয় পিতা, না হয় ভাই কিংবা সন্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয় । দ্বিতীয়ত: কেবল পুরুষেরা উপার্জন করে বলেই আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক । সাংস্কৃতিক কাঠামোও তাই পুরুষাধিত্যেই পর্যবসিত । ফলে সমাজের প্রায় সকল প্রকার নিয়ম-কানুন বাধ্যবাধকতা, আচার-আচরণ,

বিধিনিষেধ সব কিছুই নির্মিত হয়েছে (বা এখনও হচ্ছে) পুরুষের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী। ফলে এরকম একটি সমাজে নারীর প্রতিটি পদক্ষেপই বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। আর এর কারণে বিধবা হয়ে পড়া একজন নারী আশ্রয়হীন, উপার্জনহীন, ভারাক্রান্ত ইত্যাদি হওয়া সত্ত্বেও তার উপর আরোপিত হাজার নিয়ম-কানুন (ধর্মীয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক) তাকে আরো বেশি পর্যদুস্ত করে তোলে। ফলে সেই নারীকে স্রেফ একটি লোকের দৈব মৃত্যুর মূল্য সমস্ত জীবন দিয়ে দিতে হয়।

মানুষের মৃত্যু অস্বাভাবিক নয় কিন্তু একটি মানুষের মৃত্যু অন্য একটি মানুষকে মৃত্যুর চেয়েও বিভীষিকার দিকে ঠেলে দেয়ার মত সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি কখনও কাম্য হতে পারে না। কিন্তু যুগ যুগ ধরে বিধবা নারী নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং সন্তান সন্ততিসহ সেই বিভীষিকাময় দিনই কাটিয়ে যাচ্ছেন।

২. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

নাগরিক উদ্যোগ ১৯৯৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে তার কর্মএলাকা টাঙ্গাইল এর এলেঙ্গা, কালিহাতী, বল্লা ইউনিয়ন এবং বদরগঞ্জ জেলার দামোদরপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেণী, বয়স, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকা বিধবা নারীদের ওপর একটি গবেষণা করে বাংলাদেশে বিধবা নারীদের একট সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে। গবেষণাটি মূলতঃ প্রাথমিকভাবে বিধবা নারীদের চালচিত্র তুলে ধরলেও এরই মধ্যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও লিঙ্গীয় চিত্রের ব্যাপকতা বিদ্যমান।

গবেষণাটির ভিত্তি ও পরিধি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হলেও সামগ্রিক বিচারে একটি ব্যাপক ভিত্তিক মুল্যায়ন করার সুযোগ এখানে রয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মূলত এটাই।

বিধবা নারীদের সম্পদ ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নোত্তর ফর্মেট সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মোট ৮৬ জন নারীকে এ গবেষণায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল। গবেষণার সুবিধার্থে টাঙ্গাইল এবং বদরগঞ্জের তথ্যসমূহ একত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. উত্তরদাতার বয়স

২০ এর কম বয়স থেকে ৪৫ এর উপর পর্যন্ত উত্তরদাতার বয়সকে ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। টেবিল ১-এ লক্ষ্যণীয় মোট ৮৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিধবা ৩০ জন এর বয়স ৩৬-৪০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক ৩ জন বিধবা নারীর বয়স ২০ এরও নীচে।

সারনী ১: উত্তরদাতার বয়স

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
> ২০ এর নীচে	৩	৩.৪৯
২১-২৫ বছর	৮	৯.৩০
২৬-৩০ বছর	১৮	২০.৯৩
৩১-৩৫ বছর	১৬	১৮.৬০
৩৬-৪০ বছর	৩০	৩৪.৮৯
৪১-৪৫ বছর	১০	১১.৬২

৪৫+ বছর	১	১.১৭
মোট	**৮৬**	**১০০**

স্ত্রীর সাথে স্বামীর বয়সের পার্থক্য, দারিদ্রের কারণে, অসুস্থতায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টির অভাবে অনেক নারীকেই অকালে বিধবা হতে হচ্ছে। সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এদের অনেকেরই বিয়ের বয়স থাকা সত্ত্বেও এরা পুনরায় বিয়ে করেননি। সামাজিক সমালোচনার ভয়েও এদের অনেকের আর বিয়ে করা হয়নি।

৪. বৈধব্যের সময়কাল

উত্তরদাতা বিধবা মহিলারা কত বৎসর আগে বিধবা হয়েছেন তার চিত্র ফুটে উঠেছে টেবিল ২-এর মাধ্যমে।

সারনী ২: বৈধব্যের সময়কাল

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
> ১ বছর	১৩	১৫.২২
২-৪ বছর	২৫	২৯.০৭
৫-৭ বছর	২৪	২৭.৪১
৮-১০ বছর	১৭	১৯.৭৭
১১-১৩ বছর	৩	৩.৪৯
১৪-১৫ বছর	২	২.৩২
১৬+ বছর	২	২.৩২
মোট	**৮৬**	**১০০**

ইসরাত শামীম এবং খালেদা সালাহউদ্দীন তাদের Widows in Rural Bangladesh Issues and Concerns গবেষণা গ্রন্থে বিধবা নারীদের সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। 'সমাজে বিধবা নারীরা মর্যাদাগতভাবে বৈষম্য, উৎপীড়ন ও কোনঠাসা অবস্থার শিকার। নারী হিসেবে তো বটেই, অধিকন্তু বিধবা নারীরা সামাজিকভাবে আরো বেশি অধস্তনতার শিকার হচ্ছেন। এই বিধবা নারীরা আইনগত, ধর্মীয়, প্রথাগত এবং চিরাচরিত নানা বাধার সম্মুখীন। এই বাধার কারণে তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত, জমির মালিকানা পেলেও তা ব্যবহারের সুযোগ বঞ্চিত। .....' 'স্বামীর মৃত্যুর পর একজন সদ্য বিধবা নারীর শোকে কাতর হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না। নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, মানবিক মর্যাদা হারানোর কারণে সমাজ ও সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণও তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।'

বয়স কম বেশী যাই হোক না কেন স্বামীর মৃত্যুতে এ সকল বিধবা নারীর পোশাকের রং বদলে গেছে (বিধবার রঙ্গীন পোষাক সামাজিকভাবে দৃষ্টিকটু)। খাওয়া-দাওয়ার নিষেধাজ্ঞা এসেছে, উৎসব অনুষ্ঠানে বিধবা নারীর উপস্থিতি অকল্যানজনক হয়েছে। এমনকি পরিবারেও তারা বিধবা নারী হিসেবে ভিন্ন ব্যবহার পেয়ে আসছেন বৈধব্যের শুরু থেকেই। বিধবা নারী হিসেবে সামাজিক অন্যান্য বৈষম্য তো আছেই।

৫. বিধবা হওয়ার সময় বয়স

স্বামী মৃত্যুর সময় ১২.৭৯% নারীর বয়স ছিল ২০ এরও নীচে। যে বয়সে একজন নারীর হেসে খেলে বেড়ানোর কথা সে বয়সে ঐ নারীকে বৈধব্যের গ্লানি, শোক বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। খাওয়া পড়া, চলাফেরা সকল কিছুতে তাকে সুচারুরূপে বৈধব্য ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে।

সারনী ৩: বিধবা হওয়ার সময় বয়স

বিধবা হওয়ার সময় বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
> ২০ এর নীচে	১১	১২.৭৯
২১-২৫ বছর	১৯	২২.০৯
২৬-৩০ বছর	২০	২৩.৩২৬
৩১-৩৫ বছর	১৮	২০.৯৩
৩৬-৪০ বছর	১৫	১৭.৪৪
৪১-৪৫ বছর	৩	৩.৪৯
মোট	**৮৬**	**১০০**

২১-২৫ বছর বয়সী ২২.০৯% বিধবা নারী বা ২৬-৩০ বছর বয়সী ২৩.২৬% বিধবা নারীর পুনর্বার বিয়ে হওয়াা যে সামাজিকভাবে দৃষ্টিকটু বা ঝামেলাপূর্ণ বৈধব্যের পর এই নারীদের বিয়ে না হওয়া বা না করাটা তার একটা প্রমাণ। এই বিধবা নারীদের অনেকেরই সন্তান আছে। দ্বিতীয় বিয়ে করে নিজের জীবনের গতি হলেও তার সন্তানের দুর্গতির কথা চিন্তা করেই অনেক নারী পুর্নবার বিয়ে করতে চান না। এছাড়া, বিধবা নারীকে বিয়ে দিতে অনেক ক্ষেত্রেই 'ভাল বর' পাওয়া যায় না প্রথম স্ত্রী হিসেবে বিধবা নারীকে পাত্ররা পছন্দ করেন না আর যদি করে ও তাতে টাকা পয়সার লেনদেন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ থাকে। পাত্রের ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় যে বিয়েই হোক না কেন 'স্বামী খাওয়া' (বিধবা নারীর প্রতি সমাজের মনোভাব) নারীকে পুনর্বার বিয়ে দেওয়া শুধুমাত্র উচ্চ অংকের যৌতুকের বিনিময়েই সম্ভব।

৬. বিধবা নারীর সন্তান

গবেষণায় দেখা গেছে বিধবা নারীদের অধিকাংশরই এক বা একাধিক সন্তান আছে । এই বিস্তারিত চিত্রটি সারনী ৪-এ ফুটে উঠেছে।

সারনী ৪: বিধবা নারীদের সন্তান সংখ্যা

সন্তান সংখ্যা	ছেলে	মেয়ে
১ জন	৪১	২৩
২ জন	২০	১৭
৩ জন	১০	১০
৪ জন	৩	৫
৫ জন	১	১
৬ জন	-	২

গ্রাম বাংলায় সীমাহীন দারিদ্র অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়, কিন্তু বিধবা হয়ে পড়া একজন সহায় সম্বলহীন নারী, যে নিজেই তার দরিদ্র পিতা বা ভাইয়ের (কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বশুর বাড়ির) গলগ্রহ তার সন্তানদের ভরনপোষন বা লেখাপড়া একটা অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা । যা সাধারনত ঘটে না । ।

M.A. Mannan, Widows and other women heads of households in rural Bangladesh: Well-being and survival strategies, Grameen Trust এর রিপোর্টে দেখিয়েছেন, বিধবা মেয়েদের সন্তানদের শারীরিক অবস্থা সবল থাকে না। এটা শুধুমাত্র তার মায়ের আর্থসামাজিক অক্ষমতার কারণে নয়, এর কারণ এদের বিধবা মায়ের শ্রমের উপর নির্ভর করতে হয়। বাসস্থানের নিশ্চয়তা, সন্তানের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে বিধবা মায়েরা ব্যর্থ হয়, এমনকি পরিবারের প্রতি সন্তানের আস্থা গড়ে তুলতে ও ব্যর্থ হয়। বিধবা নারীর সন্তানদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সকল সুযোগ সুবিধা নিয়ে বেড়ে ওঠা হয় না।

পিতার মৃত্যুর পর সন্তানের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ধরন বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা জীবন গ্রন্থে নিজের ধরনে ফুটে উঠেছে,

'মৃত্যুর আগে বাবাই পরিবারের সকল দায়িত্ব পালন করতেন। তার উপার্জনেই সংসার চলছিল টিমটিম করে। বাবার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই গোটা পরিবার এক নিদারুন সংকটে পড়ে যায়। সখিনা চোখে- মুখে অন্ধকার দেখেন। বাবার মৃত্যুর আগে সখিনা দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন 'চকে' (মাঠে) ছাগল-ভেড়া চড়িয়ে জ্বালানী কাঠ সংগহ করে। ছোট ভাইটি কোন কাজই করতো না। বাবার মৃত্যুর পর নিয়ম পাল্টে যায়। মা নিজের কাজ ছাড়াও পরের বাড়ীর ধান ভানার কাজ শুরু করেন। ছোট ভাইটিকেও পরের বাড়ীতে কামলার কাজে লাগানো হয়। সখিনা নিজেও মায়ের সাথে সাথে অন্যের বাড়ীতে কাজে যেতে শুরু করেন।'

পৃষ্ঠা ৮১, সখিনার নতুন পরিচয়,

সারনী ৫: বৈধব্যের সময় বিধবা নারীদের সন্তানের বয়স

সন্তানের বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
গর্ভবতী / ১ বছর	৫	২
৪-৬ বছর	১১	৯
৭-৯ বছর	৭	৯
১০-১২ বছর	১৩	৯
১৩-১৫ বছর	৪	১২
১৬-২০ বছর	৯	২২
২১-২৫ বছর	১০	১০

৭. বিধবা হওয়ার পর স্বামীর পরিবার থেকে সহায়তা প্রাপ্তির নমুনা

একজন নারীর কাছে 'স্বামীর সংসার 'বলতে আলাদা কিছু থাকে না, সেটা বস্তুত তার নিজের সংসার। এই নিজের সংসারে সে শ্রম দেয় নি:স্বার্থভাবে । কিন্তু সেই স্বামীটির মৃত্যুর পর প্রায়শই দেখা যায় সেই নারী সেখানে পর হয়ে যায়। 'নিজের সংসার' কথাটার স্থায়িত্ব টিকে থাকলে সেখান থেকে সহযোগিতার কোনো প্রশ্ন আসতো না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে বেশির ভাগ নারীর সম্পর্ক শ্বশুর বাড়ি থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। সারনী ৬-এ তার একটা চিত্র পাওয়া যায়।

সারনী ৬: স্বামীর পরিবারের সাহায্য সহযোগিতর ধরন

স্বামীর পরিবারের সহায়তা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কেন সহযোগিতা পাইনি	৪৯	৫৬.৯৮
সহযোগিতা পেয়েছি	৩	৩.৪৯
শুধু স্বামীর ভিটায় আছি	৩৪	৩৯.৫৩
মোট	**৮৬**	**১০০**

এখানে দেখা যাচ্ছে বিধবা নারীদের মাত্র ৩.৪৯% স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ পরিবার থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেয়েছেন। শ্বশুরবাড়ী থেকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা না পেলেও স্বামীর ভিটায় আছেন ৩৯.৫৩% । স্বামীর পরিবার থেকে কোন ধরণের সহযোগিতা পায়নি এ ধরণের বিধবা নারীর সংখ্যা বেশী আছে ৫৬.৯৮% । স্বামীর পরিবার থেকে কোন ধরণের সাহায্য না পাওয়ার কারণ হিসেবে গবেষিত বিধবা নারীদের অনেকে জানিয়েছেন। 'শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা ভাল না, দারিদ্র্যের কারণেই শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের পক্ষে মৃত ছেলের বৌ এর বিপদে পাশে দাড়ানো সম্ভব হয়নি।

'আমার স্বামী দিন মজুরী করতো সেই টাকায় সংসার চলতো' স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসারের আয় রোজগার বন্ধ হইয়া গেছে। এরাই অনেক কষ্টে খাইয়া, না খাইয়া বাইচা আছে, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আমারে খাওয়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' এরকম বক্তব্য বহু বিধবা নারীর। এই বিধবা নারীরা বুঝতে পেরেছে অভাব অনটনের কারণেই শ্বশুর বাড়ীর পক্ষে সাহায্য সহযোগিতা করা অসম্ভব ছিল। তাই সাহায্য সহযোগিতা না পেলেও তাদের আক্ষেপ কম।

আবার অনেক বিধবা নারী বলেছেন, 'শ্বাশুরী বলে আমি অভাগী, আমার কপাল দোষে আমার স্বামী মরছে। স্বামীর মরনের পর কান্দন না ফুরাতেই তারা বাচ্চ কোলে দিয়া আমারে ঘর ছাড়া করছে'।

আবার অনেকেই বলেছেন, 'শ্বশুরের অনেক আছে কিন্তু এতিম বাচ্চাগুলির দিকে তারা ফিরাও তাকায় নাই।'
বিধবা নারীদের মধ্যে যারা স্বামীর ভিটায় আছেন তারা বলেছেন, স্বামীর তোলা ঘর বলেই তারা থাকতে পারছেন, তা না হলে শ্বশুরের ভিটায় থাকতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে।

এদের পাশাপাশি ৩.৪৯% বিধবা নারী শ্বশুর বাড়ীর সহযোগিতা পেয়েছেন। চরম সংকটকালীন সময়ে শ্বশুরবাড়ীর লোকজন তাকে ফেলে দেয়নি বরং সংকট কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছে।

৮. পিতার পরিবার থেকে সহায়তা প্রাপ্তির নমুনা

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী পিতার পরিবার থেকে কী ধরণের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন সারনী ৭-এ তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সারনী ৭: পিতার পরিবার থেকে সাহায্য সহযোগিতার ধরন

সহযোগিতার ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কোন সহযোগিতা পাইনি	৫৭	৬৬.২৮
সহযোগিতা পেয়েছিল	১৯	২২.১০
বাবার ভিটায় আছি	১০	১১.৬২
মোট	**৮৬**	**১০০**

পিতার পরিবারের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে ৬৬.২৮% নারীই পিতার পরিবার থেকে কোন সাহায্য পায়নি। এর কারণ হিসেবে অনেকে বলেছেন, 'বাবা নেই, মা ভিক্ষে করে খায়, আমাকে সাহায্য করার মত কোন অবস্থা তাদের নেই।' অনেকে বলেছেন, 'বাপ-ভাই মজুরের কাম করে, সংসার বড়, আমারে পালনের মত অবস্থা তাগো নাই'। অনেকে বলেছেন, বাপ নেই, বাপ থাকলে ফিরাইতে পারত না।' উত্তরদাতা বিধবা নারীদের অনেকে জানিয়েছেন পিতার পরিবারের নিদারুন অভাব অনটনে তাদের নিজেদেরই সংকটের কথা, খেয়ে না খেয়ে তাদের বাপ ভাইদের বেঁচে থাকার কথা।

পিতার পরিবার থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন ২২.১০% জন। পিতার পরিবারের সহযোগিতা পেয়েছেন যে নারীরা বা বাবার ভিটায় বর্তমানে আছেন এমন উত্তরদাতারা জানিয়েছেন, স্বামীর পরিবার থেকে যখন তারা কেন ধরনের সাহায্য পান নাই তখন তাদের বাবাই তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। ধান, চাল দিয়ে, টাকা-পয়সা দিয়ে ঘর তুলে তাদের সন্তানদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়ে, সেই অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

৯. স্বামীর পরিবারের জমি-জমার বিবরণ এবং উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা

৩৯.৩০% বিধবা নারীর স্বামী বা স্বামীর পরিবারের কোন জমিজমা নেই। স্বামীর পরিবারের জমি আছে ৪০.৭০%। এই গবেষণায় দেখা গেছে ২৫.৭২% এর ক্ষেত্রে স্বামীর সম্পত্তি স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা ভোগ করতে পারছে।

সারনী ৮: বিধবা নারীর স্বামীর জমি থাকা না থাকার ধরন

স্বামীর পরিবারের জমিজমার পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জমি-জমা আছে	৩৫	৪০.৭০
জমি-জমা নেই	৫১	৫৯.৩০
মোট	**৮৬**	**১০০**

ছেলে-মেয়েরা সে সম্পত্তি ভোগ করতে পারছে কিনা নিচের সারনীতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত ওয়ারিশদের যে অধিকার জন্মায় তাকে বলে উত্তরাধিকার। মৃত ব্যক্তি মহিলা বা পুরুষ যেই হোক একই নিয়মে তার উত্তরাধিকার নির্নয় করা হবে। যে সমস্ত ওয়ারিশ উত্তরাধিকার থেকে কখনই বাদ পড়েন না তারা হলেন- পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী।

সারনী ৯: বিধবা নারীর সন্তানদের পিতার সম্পত্তি ভোগ করার ধরন

পিতার সম্পত্তি ভোগ করতে পারছে	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৯	২৫.৭১
না	২৬	৭৪.২৯
মোট	**৩৫**	**১০০**

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী নারী কন্যা, মাতা ও স্ত্রী হিসেবে সকল অবস্থাতেই সম্পত্তির কিছু অংশের অধিকারী। সেই হিসেবে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির (ক) মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান নিম্নগামী অধঃস্তন বংশধর বিদ্যমান না থাকলে স্ত্রী সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পাবে। যদি সন্তান না থাকে তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তিতে আট ভাগের একভাগ পায়। (খ) মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকলে স্ত্রী (এক বা একাধিক থাকলে) এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে আটের একভাগ পাবে।
সন্তান হিসেবে বাবার সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ের উত্তরাধিকার রয়েছে।
সম্পত্তি লাভের তিন অবস্থা হতে পারে:

মেয়ে হিসেবে

ক. একজন কন্যার অংশ $^{১}/_{২}$ (পুত্র না থাকলে)
খ. দুই বা ততোধিক কন্যার অংশ $^{২}/_{৩}$ (পুত্র না থাকলে)
গ. পুত্র থাকলে কন্যা বা কন্যাগন অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়।

কোরানিক অংশীদার হিসেবে কন্যার অংশ যদিও নির্দিষ্ট আছে কিন্তু যখনই পুত্র ও কন্যা একসাথে থাকে তখনই কন্যা পুত্রের সাথে অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি পায়।

ছেলে হিসেবে

ছেলে সব সময়ই অবশিষ্টভোগী হিসেবে সম্পত্তি লাভ করে। মৃত ব্যক্তির একাধিক ছেলে থাকলে সব ছেলেই সমান অংশ পায়।

এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে পিতার সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও মাত্র ২৫.৭১% উত্তরাধিকারীরা সে সম্পত্তি ভোগ করতে পারছে। ৭৪.২৯%-ই পিতার সম্পত্তির কোন অংশ ভোগ করতে পারছে না। গবেষনায় লক্ষ্য করা গেছে 'পিতার সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকার কোন নারী পায় না। অনেকক্ষেত্রেই বোন জানেন যে ভাই নামমাত্র সম্পত্তি তাকে দিচ্ছে, কিন্তু ভাইবোনের আন্তরিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে মনে করে বোন কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। কোন বিপদে পড়লে ভাই তাকে আশ্রয় দিবে এই আশায় স্বাভাবিক সম্পর্ক বোনটি রক্ষা করতে চায়।'

'Widows in Rural Bangladesh: Issues and Concerns-Ishrat Shamin & Khaleda Salahuddin, তাদের গবেষণা গ্রন্থে সম্পত্তিতে নারীদের আইনগত সচেতনতা সম্পর্কে দেখিয়েছেন, ৪৮.২৪% মুসলিম বিধবা নারী শরীয়া আইন সম্পর্কে জানেন। যেখানে স্বামী এবং পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্পর্কে বলা আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে খুব নগণ্য সংখ্যক নারীই সম্পত্তিতে তাদের অধিকার দাবী করতে পেরেছেন। কিন্তু বিধবাদের ক্ষেত্রে এখনও সম্পত্তিতে তাদের আইনগত অধিকারের দাবী উঠানো কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। বিশেষত: যাদের কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দানে সক্ষম পুরুষ নেই .....' 'বিধবারা একই সাথে দুখী এবং হতাশাগ্রস্ত। তারা আইনী সহায়তার প্রয়োজনে পরিবারের বাইরে চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে না।'

Widows and Other Women Heads of Household in Rural Bangladesh: Well being and Survival Strategies - M.A Mannan, BIDS গবেষণা গ্রন্থে পরিত্যক্তা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের নাজুকতা তুলে ধরেছেন। 'প্রায়শই দেখা যায় সমর্থ পুত্রের অভাবে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও পরিত্যাক্ত নারীদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে এবং তারা ন্যায্য জমি ও সম্পত্তি টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে পরাজিত হয়।'

সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এই বিধবাদের শেষ পর্যন্ত অন্যের দয়া দাক্ষিন্যের ওপর নির্ভর করেই শেষ পর্যন্ত তাদের টিকে থাকতে হয়। বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা জীবন গবেষণায় ময়ফল বেওয়ার সংসারে তার একটি ধরন ফুটে উঠেছে –'স্বামীর মৃত্যুর পর ময়ফলের নতুন জীবন শুরু হয়। কয়েকদিন পাড়ার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে 'চাইয়া-চিন্তিয়া' ময়ফল দিন কাটান। তারপর থেকে বাড়ীতে কাজ করা শুরু করেন। ছেলে পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে ফিরে কিছু কিছু হাঁড়ি-পাতিল এনে নিয়মিতভাবে বিক্রি করতে থাকে। মাতাপুত্রের সামান্য আয় দিয়ে জীবন নদী দঃুখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে অলস গতিতে, অভাব আর দারিদ্র্যকে সার্বক্ষণিক সংগী করে।'

১০. পিতার পরিবারের জমিজমার বিবরণ

পিতার সম্পত্তিতে সন্তান হিসেবে পুত্র এবং কন্যা দুইজনই অংশীদার। একজন পুত্র তার পিতার সম্পত্তিতে যতখানি ভাগ পায় তার অর্ধেক পায় কন্যা এবং এই কন্যা বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক পিতা, ভাই বা স্বামীর মেয়ে, বোন বা স্ত্রী হলেও তাদের অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ ভোগ করতে বা বিক্রি করতে পারে না। এই গবেষণায় বিধবা নারীদের পিতার পরিবারের জমিজমার থাকা না থাকার পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে সারনী ১০ এর মাধ্যমে।

সারনী ১০: বিধবা নারীর পিতার জমি জমার ধরন

পিতার জমিজমা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
আছে	২৯	৩৩.৭২
নাই	৫৭	৬৬.২৮
মোট	**৮৬**	**১০০**

এই ছকের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে পিতার পরিবারের জমি আছে ৩৩.৭২% বিধবা নারীর। এবং ৬৬.২৮% বিধবা নারীদের পিতার পরিবারের কোন জমিজমা নাই। যে সকল বিধবা নারীর পিতার জমিসম্পত্তি আছে সারনী ১১ এর মাধ্যমে তাদের সে সম্পত্তি ভোগ করতে না পারার একটি হিসেব তুলে ধরা হয়েছে।

সারনী ১১: বিধবা নারীরা পিতার সম্পত্তি ভোগ করতে পারছেন কিনা তার ধরন

পিতার সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারছেন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৮	২৭.৫৯
না	২১	৭২.৪১
মোট	**৩৫**	**১০০**

এই ছকে দেখা যাচ্ছে ৭২.৪১ ভাগ বিধবা নারীরই পিতার সম্পত্তিতে ন্যায্য উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও তা ভোগ দখল করতে পারছেন না। ভোগ দখল করতে পারছেন মাত্র ২৭.৫৯ ভাগ অর্থাৎ মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন তাদের জীবনে ঘটেনি। আবার যারা পিতার জমি পেয়েছেন তারাও যে আইন অনুযায়ী ন্যায্য বন্টন পেয়েছেন তাও নয়। বাবার অবর্তমানে অনেক ভাই-ই বোনকে সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দিতে অনাগ্রহ দেখান। আবার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে, ভবিষ্যতে আরো বিপদে পড়লে ভাইয়ের বাড়ীতে পুনর্বার আশ্রয় নাও পাওয়া যেতে পারে, ভাইয়ের কাছে দাবী দাওয়া করা সম্ভব না এরকম দুশ্চিন্তার কারণে অনেক বোনই ভাইয়ের কাছ থেকে তার

ন্যায্য অংশ বুঝে নেন না। আবার জমি বুঝে পেলেও পরবর্তীতে টাকার অভাবে ভাইয়ের কাছেই জমির ন্যায্য দামের চাইতে কম দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। আবার অনেক বোনই বিয়ের সময় যৌতুক বা বিয়ের অন্যান্য খরচ বাবদ বাবা-ভাইদের টাকা পয়সার বহুল খরচের করার কারণে ঐ জমিজমায় তার অংশ যে বহাল আছে তাও ভাবতে পারেন না। পিতার সম্পত্তিতে শুধুমাত্র ভাইদের অধিকার আছে এরকম ধারণার কারণেও বাবার সম্পত্তি তার কন্যার ভোগ করা হয়ে ওঠে না। কিন্তু পিতার সম্পত্তিতে কন্যার ন্যায্য অংশপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারলে বিধবা নারী সন্তান সন্ততিসহ যে অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটান তা কিছটা হলেও রোধ করা সম্ভব হতো। অন্তত: মানসিকভাবে তিনি শক্তি পেতেন।

১১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিধবা নারীর জন্য সহযোগিতা

বাংলাদেশ সরকার বিধবা মহিলাদের বেঁচে থাকার সহায়তা প্রদানের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচী শুরু করেছে ১৯৯৫ সালে। খাস জমি বরাদ্দেও বিধবা নারীদের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগেও এ ধরনের পরিবারকে সহায়তা দানের গুরুত্বের কথা বলা আছে। সারনী ১২-এর মাধ্যমে আমরা দেখবো বিধবা নারীরা সরকারী পর্যায়ে কি ধরণের সহায়তা পেয়েছেন তার নমুনা।

সারনী ১২: রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিধবা নারীর জন্য সহযোগিতার ধরন

সাহায্য প্রাপ্তির নমুনা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভিজিএফ কার্ড পেয়েছেন	৩২	৩৭.২০
কোন প্রকার সাহায্য পাননি	৪৮	৫৫.৮২
কিছু কিছু চাল গম পেয়েছেন	৬	৬.৯৮
মোট	**৮৬**	**১০০**

ভিজিএফ সহায়তা পেয়েছেন ৩৭.২০% কিন্তু সাহায্যের আশা করেছিলেন আরো বেশী সংখ্যক বিধবা নারী। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সীমাবদ্ধতা বিধবা নারীদের অবস্থানকে নাজুক করে তোলে। সরকার থেকে বিভিন্ন সময়ে কিছু পরিমাণ চাল-গম পেয়েছেন মাত্র ৬.৯৮%। এ পর্যন্ত কোন প্রকার সাহায্যই রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাননি এমন বিধবার সংখ্যা ৫৫.৮২%। স্বামীর সম্পত্তির অংশ না পাওয়া পিতার সম্পত্তির ভাগ না পাওয়া শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কাছ থেকেও কোন সহায়তা না পেয়ে এই বিধবা নারী কেমন আছেন? এই বিধবা নারীদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে সীমিত করে দিয়েছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

১২. বর্তমান উপার্জন ভরণপোষণের ধরণ

স্বামীর উপার্জনের উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল থাকেন নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই নারীকেই টিকে থাকার প্রয়োজনে বিভিন্ন পেশা বেছে নিতে হয় নিচের সারনী তে তা তুলে ধরা হল:

সারনী ১৩: বিধবা নারীদের বর্তমান উপার্জনের ধরন

কিভাবে চলছেন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বাবা খাওয়াচ্ছে	৪	৪.৬৬
ছেলে চালাচ্ছে	৯	১০.৪৭
ভিক্ষা করে	৫	৫.৮১
অন্যের বাড়ীতে কাজ করে	২৮	৩২.৫৬
নিজে রোজগার করে	৪১	৪৭.৬৭
ক্ষুদ্র ব্যবসা করে	৬	৬.৯৮

এই সারনীর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে বিধবা নারীদের মধ্যে নিজে বিভিন্নভাবে আয় রোজগার করছেন ৪৭.৬৭%, ক্ষুদ্র ব্যবসা করেছেন ৬.৯৮%। এদের অধিকাংশকেই স্বামীর জীবদ্দশায় কাজের জন্য বাইরে বেরুতে হয়নি। এ সকল বিধবা নারী তাদের কাজে বের হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেছেন, 'সমাজ মেনে নেয়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর যখন ঘরের বাইরে কাজে বের হলাম তখন অনেকেই বিয়ে নিয়ে কথা বলেছিল, নানাভাবে বিপদে ফেলেছিল কিন্তু কেউ সাহায্য করেনি। দুশ্চরিত্রার অপবাদ মাথায় থাকলেও সংসারের সন্তানের প্রয়োজনে কাজ করা ছাড়া কোন উপায়ই আমার ছিল না।'

এই বিধবা নারীদের মধ্যে ৫.৮১% ভিক্ষা করে, ৬২.৫৬% অন্যের বাড়ীতে কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি সমাজের অবহেলা, সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে নারীকে ঠকানো, সরকার কতৃক উপযুক্ত কর্মসংস্থান তৈরী না হওয়াতে এই নারীরা এ ধরণের পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বামীর বাড়ীতে বাবার বাড়ীতে যখন ঠাই মিললোনা, ভাল পেশা বেছে নেবার মত যোগ্যতাও যখন থাকেনা তখন ঐ নারীর ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে কি?

এই বিধবা নারীদের মধ্যে ৪.৬৬% নারী বাবার আশ্রয়ে আছেন, ছেলের আশ্রয়ে আছেন ১০.৪৭%। এ বিধবা নারীরা পিতা বা সন্তানের আশ্রয়ে থাকলেও এই তাকার বিনিময়ে সে পরিবারে নানাভাবে শ্রম দিচ্ছেন। শুনতে খারাপ শোনালেও ঐ শ্রমের ভিত্তিতেই ঐ পরিবারে তার খাওয়া, পড়া নিশ্চিত হয়। গ্রামবাংলার ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যে ঐ পরিবারের পক্ষেও এভাবে মূল্যায়ণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এই বিধবা নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে এই বিধবা নারীদের কেউই অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে চাইতেন না। কিন্তু প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের যেখানে স্বনির্ভর হতে দেওয়া হয় না সেখানে এই সংবেনশীল সময়ে অন্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমরা এই গবেণায় দেখেছি ঘরের বাইরের উপার্জনে যারা বের হয়েছেন তাদের পেশা যাই হোক না কেন দুর্নামের কালী তাদের গায়ে মাখা হয়ে গেছে। বিভিন্ন সমিতি থেকে ঋণ নেয়া, গাছের চারা বড় করা, বিক্রি করা, কাপড়ে ফুল তোলা, বাঁশ বেতের কাজ করা,

সামান্য শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে অফিসে কিছু কাজ করার মধ্যে বিধবা নারীরা কোন দোষ খুঁজে না পেলেও পুরুষ সাশিত সমাজ তার মধ্যেই দোষ খুঁজে পান ।

১৩. বর্তমান বাসস্থান

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর চূড়ান্ত ও স্থায়ী আশ্রয়স্থল হলো স্বামীর বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি । এজন্যই কন্যার পিতারা যৌতুক দিয়ে,অনেক খরচ হলেও মেয়েকে সেখানে পাঠানোর জন্য যথাসাধ্য করেন । কিন্তু তবু অনেক নারীকে বিধবা হওয়ার পরাবার বাপের বাড়িতেই ফেরত আসতে হয় । সারনী ১৪-তে বিধবা নারীদের বর্তমান আশ্রয়স্থলের একটা চিত্র ফুটে উঠেছে ।

সারনী ১৪: বিধবা নারীদের বর্তমান আশ্রয়স্থল

আশ্রয়স্থল	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বাবার বাড়ি	২৬	৩০.২৩
ভাইয়ের বড়ি	২	২.৩২
নিজের বাড়ি	৯	১০.৪৭
স্বামীর বড়ি(শ্বশুর বাড়ি)	৪৮	৫৫.৮১
অন্যের বাড়ি	১	১.১৭
মোট	**৮৬**	**১০০**

৫৫.৮১% বিধবা নারী স্বামীর বাড়ীতেই আছেন । বিয়ের পর স্বামী শ্বশুরের ঘর হয় নারীর আসল ঘর । এ রকম দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই স্বামীর মৃত্যুর পরও আর অধিকাংশ নারীর বাবার ঘরে ফিরে আসতে পারে না ।

পাত্রপক্ষের হাতে কন্যা তুলে দেওয়ার পর বিয়ের সময় বাবার ঘর এমনকি তার গ্রামও নারীর কাছে পর হয়ে যায় । সন্তানের পিতৃপরিচয় ধরে রাখাও শ্বশুর বাড়ীতে বিধবা নারীর থাকতে চাওয়ার একটি বড় কারণ । বর্তমানে বিধবা নারীদের ৩০.২৩% বাবার বাড়ী আছেন । স্বামী গৃহে অভাব, শ্বশুরের পরিবারের দারিদ্রের কারণেই বাবার বাড়ীতে এই বিধবা নারীরা আশ্রয় নিয়েছেন । এছাড়া বিধবা নারীদের ২.৩২% ভাইয়ের বাড়ী, অন্য আত্মীয়ের বাড়ী ১.১৭% এবং পিতা বা শ্বশুরের সংসারে না থেকে আলাদা বাড়ীতে আছে ১০.৪৭% বিধবা নারী বা স্বামীর সম্পত্তিতে ন্যায্য অংশ না পাওয়া, বিধবা নারীর পুনরায় বিয়ের ক্ষেত্রে সমাজের মেনে না নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী, নারী শিক্ষার দূর্বলতার কারণে নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেনা । ১০.৪৭% স্বাবলম্বী বিধবা নারীর উদাহরণ বাদ দিলে বিধবা নারীরা যে কাছেন আত্মীয় স্বজনের কাছে নিজের এবং সন্তানের খাওয়া, পড়ার জন্য নির্শরশীল এতে কোন সন্দেহ নেই ।

১৪. উপসংহার

মানুষের মৃত্যুতে তার আপনজন শোকাহত হবে সেটাই স্বাভাবিক ,স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী শুধু শোকাভিভূত নয়- শোকে মূহ্যমান হয়ে এমনকি পাগলও হয়ে যেতে পারেন কিন্তু মানুষ আবার ক্রমে ক্রমে শোক সামলে ওঠার ক্ষমতাও রাখে । আবার একসময় সবকিছু একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলে আসে । কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে কোন নারীর ঘরছাড়া হওয়াটা, ঠিকানাহীন, আশ্রয় বা অবলম্বনহীন হয়ে পড়াটা ঠিক স্বাভাবিক নয় । অথচ ঠিক এই ব্যাপারটাই আমাদের সমাজে অহরহ ঘটে । একে তো সেই নারী ঠিকানা বা অবলম্বনহীন হয়ে পড়েন উপরন্তু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত নারীটিকে আরোও

ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করতে তাকেই পুরো ব্যাপারটার জন্য দায়ী করে বসে। স্বামীর মৃত্যুটাকে শুধু নারীর র্দুভাগ্য হিসেবে দেখেই 'সমাজ' ক্ষান্ত হয়না, 'স্বামীখেকো' 'রাক্ষসী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে নারীকে 'ভিলেন' পর্যন্ত বানানো হয়। কারন হলো ,আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আয়-উপার্জনে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য। নারীর কর্মসংস্থানের সামাজিকীকরন না হওয়া পর্যন্ত এটাই হবে এদেশের বিধবা নারীর সাধারন চিত্র।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সম্পাদনা মেঘনা গুহঠাকুরতা, সরাইয়া বেগম , হাসিনা আহমেদ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র

বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা সম্পাদনা ড:মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীন ব্যাংক

আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ, সম্পাদনা; সুলতানা কামাল, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন: সম্পাদনা বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর , জরিনা রহমান খান সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র

আইনের কথা, মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

Ishrat Shamim, Khaleda Salahuddin, Widows in Rural Bangladesh:Issues And Concerns, Centre For Women And Children Studies

M.A.Mannan, BIDS, Widows And Other Women Heads Of Household In Rural Bangladesh, Well Being And Survival Strategies

দ্বিতীয় ভাগঃ পরিত্যক্তা নারী

১. ভূমিকা

আমাদের সমাজে একজন নারীকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন না কোন পুরুষের ওপর বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর করতে হয়। এই নির্ভরতা আমাদের সমাজের পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্বের কারণে নারীকে তার স্বকীয়তার দিক থেকে ক্রমশ পঙ্গু করে তোলে। সমাজের কাছে তাই নারীর শিক্ষা দীক্ষা, উপার্জনক্ষমতা, সৃজনশীলতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ ইত্যাদি ব্যক্তিক গুণাবলী নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

পিতার সংসারে কন্যা শিশু শুধুমাত্র বিয়ের জন্যই উপযুক্ত হয়। তারা সুন্দরভাবে ঘর সংসার করার ট্রেনিং, আদর্শ নারী হবার ট্রেনিং পরিবার থেকে গ্রহণ করে। তারপর বিয়ের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে 'যৌতুক' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হিসেবে গণ্য হওয়ায় কন্যা সন্তান মানে একটি বাড়তি বোঝা। এই বাড়তি বোঝা নামানোর জন্য 'উপযুক্ত পাত্র' পাওয়া সহজসাধ্য নয়। এই প্রতিযোগিতার বাজারে কন্যার পিতামাতাদের ভাল পাত্র পেতে চাইলে পাত্রপক্ষের 'ডিমান্ড' পূরণ করতে হয়। ডিমান্ড অনুযায়ী টিভি, ফ্রিজ বা মোটর সাইকেল থেকে শুরু করে নগদ টাকা, বাড়ী, পাত্র বিদেশে পাঠনো, খাট, আলমারী, ঘড়ি, সাইকেল এগুলোর এদিক সেদিক হলেই পাত্র হাতছাড়া হয়ে যায়। শুধুমাত্র শিক্ষিত, ভাল চাকুরে, প্রতিষ্ঠিতদের জন্যই এই বাজার নয়, অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেকার, বেশী বয়সী অথবা একাধিকবার বিবাহিতরাও এই বিয়ের বাজারে আসতে পারে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধারের জন্য শুধুমাত্র তারা'পুরুষ' বলে।

বিয়ের উপযুক্ত পাত্র হতে গিয়ে নারীর বিকাশ মুখ থুবড়ে পড়ে, ব্যক্তি হিসাবে নারীর বেড়ে ওঠা আর সম্ভব হয় না। 'যৌতুকের' বাধ্যবাধকতায় অনেক পরিবারকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে হয়। এত রকম স্বার্থত্যাগের পরও কন্যাপক্ষকে ঐ বিয়ের স্থায়িত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা পোহাতে হয়, এই বিয়ে টিকবে কিনা 'মেয়ের' কোন খুঁত বা দোষের কারণে পূনরায় বাবার ঘরে ফিরে আসতে হবে কিনা,অর্থাৎ তাকে স্বামী পরিত্যক্তা হতে হবে কিনা। স্বামী পরিত্যক্তা মানে, স্ত্রীকে রেখে স্বামীর অন্যত্র চলে যাওয়া। স্ত্রীকে খাওয়া-পড়া দিবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া, আইনগতভাবে স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে ভরনপোষন বন্ধ করে দেয়া।

স্বামী পরিত্যক্তা নারী কারা

বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত নারীর সঙ্গে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর একটি পার্থক্য আছে। স্বামী পরিত্যক্তা নারী হলেন তারাই যাদেরকে স্বামী দেবতাটি হয় ফেলে রেখে কোথাও চলে গেছে , অথবা তালাক না দিয়েই বনিবনা না হবার কারনে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। কাজেই এদেরকে ঠিক বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তদের কাতারে ফেলা যায়না। কারন এদের অবস্থান বা অস্তিত্ব আরো বেশী অপমানজনক, আরো বেশী অসহায় । কারণ তালাক না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর বাড়ীতে ঐ নারীর পক্ষে মানুষ হিসেবে ন্যুনতম মান অপমান বোধের কারণেই ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হয়না।

স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ক্ষেত্রে যে কয়টি রকম সাধারনত দেখা যায় তা হলো স্বামী বিদেশ বা অন্য কোনো জায়গায় কাজের জন্য গিয়ে আর খোঁজ খবর নেয়না বা টাকা পয়সা পাঠায়না, এভাবে দু 'দশ বছর পার হয়ে যায়। স্বামী হয়তো অন্য কোথাও আরেকটা বিবাহ করেছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে যে তার আর ফেরত আসা হবে না । যৌতুক না পেয়ে বা ঝগড়াঝাটি করে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে মারধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিল, আর কোনদিন আসতে বারন করে দিল। পরবর্তীতে দেখা গেলো সে আবার বিয়ে করেছে । স্বামী হয়তো বেহেড মাতাল অথবা পাগল হয়ে গেছে

–সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী নিজেই বাপের বাড়ি চলে গেছে– ইত্যাদি হাজারটা কারনে তালিকাবিহীন স্থায়ী বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নারীদেরকেই এখানে 'স্বামী পরিত্যক্তা' নারী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে কোন দোষ ছাড়াই অকারণে অনেক নারীকে স্বামী পরিত্যক্তা হতে হয়। কোন নারীর স্বামী পরিত্যক্তা হওয়া বা না হওয়া পুরোটাই নির্ভর করে স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর। কোন স্বামী ইচ্ছা করলেই তার স্ত্রীকে কোন কারণ ছাড়াই পরিত্যাগ করতে পারে। যেহেতু এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর আইন নেই, এই রকম অনাসৃষ্টি করার জন্য দৃষ্টান্তমূলক কোন শাস্তি প্রদান করা হয়না। তাই এ ধরণের ঘটনা অহরহই ঘটছে। বিনা দোষে এরকম বহু নারীকে স্ত্রীকে সন্তানসহ বা সন্তাছাড়াই স্বামীর সংসার ছেড়ে আশ্রয়হীন হতে হচ্ছে বা পিতৃগৃহে ফিরে আসতে হচ্ছে।

পরিত্যক্তা অবস্থায় স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসা নারীকে সমাজ ভালো চোখে দেখে না। বিয়ের পর সংসার ঠিক রাখার যাবতীয় দায়িত্ব স্ত্রীর, এরকম ধারণা থেকে এই ঘটনার জন্য ঐ পরিত্যক্তা নারীরই দোষ খোঁজা হয় ঐ নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো দূরে থাক তার প্রতি সকলের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে ওঠে। পরিত্যক্তা নারীর ওপর সহিংসতাকেও গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখা হয় না বরং পরিত্যক্তা নারীর প্রতি এমনটিই ঘটবে, এটিই তার উপযুক্ত প্রাপ্য এরকম দৃষ্টিভঙ্গীই সমাজ পোষন করে। কিন্তু সারাজীবন সংসার করার ট্রেনিং নিয়ে স্বামীর সংসারকে নিজের সংসার মনে করে, সারা বাড়িতে গৃহিনীপনা ফুটিয়ে তোলার পরও কোন কারণ ছাড়াই একজন নারীকে স্বামী পরিত্যক্তা হতে হয়।

এই সমাজের বক্র দৃষ্টির কারণে এই নারীরা আর স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না। খারাপ মেয়ে বলে সমাজের তাচ্ছিল্যের আচরণ স্বামীর অন্যান্য আচরণে সমাজের নিশ্চুপ অবস্থান, নতুনভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার অভাবে এই নারীরা বোঝা হয়ে আবারও বাপ-ভাইয়ের সংসারে ফিরে আসতে বাধ্য হয় অল্পস্বল্প শিক্ষাকে পূঁজি করে নতুনভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন এদের অনেকে। তারপরও পরিত্যক্তা নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হেয়কর তাই সমাজের চোখে চক্ষুশুল হয়েই তাদের বেঁচে থাকতে হয়।

২. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

নাগরিক উদ্যোগ ১৯৯৯ সালের মে-জুন মাসে (০৮-০৫-৯৯ থেকে ০৮-০৬-৯৯) কর্মএলাকা টাঙ্গাইল এর কালিহাতী, বল্লা, এলেঙ্গা এবং বদরগঞ্জ এর দামোদরপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন শ্রেণী, বয়সের ৮৩ জন পরিত্যক্তা নারীকে গবেষণার আওতায় এনে তাদের সামগ্রিক অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা কিভাবে নারীকে অন্যের খেলার পুতুলে পরিণত করে। আইনী সুযোগ সুবিধা এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে নারীকে পাশ কাটিয়ে যায় তাও এ স্বল্প পরিসরে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শিকার 'পরিত্যক্তা নারী'এবং তাদের জীবন সংগ্রাম, তাঁদের বেচে থাকার সাফল্যকে তুলে ধরতে চেয়েছি। পাশাপাশি এই সমাজ ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে চেয়েছি যে নারী হওয়াই তাদের অপরাধ কিনা।

সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র পূরণের মাধ্যমে এ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী বয়সের পরিত্যক্তা নারীদেরকে এ গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। টাঙ্গাইল এর কালিহাতী, বল্লা, এলেঙ্গা এবং বদরগঞ্জের দামোদরপুর ইউনিয়নের মোট ৮৩ জন উত্তরদাতা এ গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করেছেন। মোট উত্তরদাতার ১২.০৪% হিন্দু এবং ৮৭.৯৬% মুসলমান। গবেষণার সুবিধার্থে সকল উত্তরদাতার তথ্যকে একত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. উত্তরদাতাদের বয়স

মোট ৮৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৬-৩০ বয়সী পরিত্যক্তা মহিলা আছেন ৩০ জন। ২০ বছরের কম বয়সী পরিত্যক্তা নারীকেও পাওয়া গেছে। ৪১-৪৫ বয়সী আছেন ১ জন। সারনী ১-এ পরিত্যক্তা নারীদের বয়স উল্লেখ করা হলো:

সারনী ১: উত্তরদাতার বয়স

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
> ২০ বছর	৬	৭.২২
২১-২৫ বছর	১৮	২১.৭৯
২৬-৩০ বছর	৩০	৩৬.১৪
৩১-৩৫ বছর	১৮	২১.৬৯
৩৬-৪০ বছর	১০	১২.০৪
৪১-৪৫ বছর	১	১.২০
মোট	**৮৩**	**১০০**

লক্ষ্যনীয়, এখানে ২০ বছরের কম বয়সী ৬ জন উত্তরদাতা আছেন। ২১-২৫ বছর বয়সী আছেন ১৮ জন। অর্থাৎ খুব কম বয়সেই তারা বিবাহর সম্পর্কে জড়িত হয়েছেন, আবার পরিত্যক্তাও হয়ে যাচ্ছেন এরকম বয়সেই। এ গবেষণায় সর্বোচ্চ ৩০ জনকে পাওয়া গেছে যাদের বয়স ২৬-৩০ বছর। যে বয়সে একজন নারী হাস্যজ্বল থাকবেন, সংসার সাজাবেন, সে বয়সে একজন পরিত্যক্তা নারীর কালিমা গায়ে মেখে সমাজে তাকে টিকে থাকতে হচ্ছে। একটি ফেলে দেয়া, বাতিল বা পরিত্যক্ত বস্তুকে সমাজ যেভাবে দেখে পরিত্যক্ত নারীর প্রতিও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী সেরকমই।

৪. পরিত্যক্তা হয়ে থাকার সময়কাল

কত বছর ধরে উত্তরদাতা নারীরা পরিত্যক্তা অবস্থায় আছেন তার সময়কাল এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। সারনী ২-এ দেখা যাচ্ছে গত ১ বছরের মধ্যে (জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত) ২১.৬৯% নারী পরিত্যক্তা অবস্থায় স্বামীগৃহ থেকে ফিরে এসেছেন। ২-৭ বৎসরের মধ্যে দু'টি ক্যাটাগরিতে মোট উত্তরদাতাদের মোট ৫৩.০২% নারী স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছেন ।এখানে একটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্যনীয় যে ১৬ বছর পূর্বে এই হার যেখানে ৩.৬১% ছিল সেখানে উত্তরোত্তর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক কাঠামোর ভিতরে পারস্পরিক ভিত্তিতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর শ্রদ্ধাবোধের অভাব, বিয়েকে পুরুষের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা অর্থাৎ যত বেশী বিয়ে তত বেশী টাকা, শিক্ষাদীক্ষার অপর্যাপ্ততা, পুরুষ হিসেবে নারীকে যখন তখন বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারার মত পুরুষের ক্ষমতার কাঠামো, সর্বোপরি নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার মতো পর্যাপ্ত দায়িত্বজ্ঞানের অভাব এই সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। এই আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারী বা বৌ বিষয়টি এত সহজলভ্য যে, যে কোন পুরুষই যে কোন সময় তা চাইলে পাল্টাতে পারে। সারনী ২ এ পরিত্যক্তা হয়ে বেঁচে থাকার সময়কাল ফুটে উঠেছে।

সারনী ২: পরিত্যক্তা হয়ে থাকার সময়কাল

সময়কাল (জুন ১৯৯৯)	সংখ্যা	শতকরা হার
> ১ বছর	১৮	২১.৬৯
২-৪ বছর	২২	২৬.৫১
৫-৭ বছর	২২	২৬.৫১
৮-১০ বছর	১৫	১৮.০৮
১১-১৩ বছর	২	২.৪০
১৪-১৫ বছর	১	১.২০
১৬ + বছর	৩	৩.৬১
মোট	**৮৩**	**১০০**

৫. বর্তমানে স্বামীর সাহায্য সহযোগিতার ধরন

উত্তরদাতা পরিত্যক্তা নারীদের কেউই বর্তমানে স্বামীর কাছ থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছেন না। এমনকি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসার সময়ও কোন ধরনের অর্থ বা সম্পদ এমনকি দেনমোহরের টাকাও তারা পাননি। পরিত্যক্তা নারীরা জানিয়েছেন, খুব অনিশ্চিত জীবনের দিকে তাদের ঠেলে দিয়েছেন তাদের স্বামীরা। স্বামীর সংসারে তারা জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিত্যক্তা অবস্থায় যে আবারও বাপ-ভাইয়ের সংসারে আশ্রয়ের জন্য ফিরে আসতে হবে তা তারা ভাবেননি।এই নারীরা কিভাবে কোথায় থাকবেন, সন্তানের খাওয়া-দাওয়া কিভাবে হবে এ জাতীয় কোন চিন্তা স্বামীরা করেনি, রাখতে চায়নি তাই পরিত্যাগ করেছে, কারো ভাল কি মন্দ চিন্তা করেনি। সারনী ৩-এ স্বামীদের দায়িত্ব কর্তব্যের একটি ধরণ দেখানো হলো:

সারনী ৩: বর্তমানে স্বামীর সাহায্য সহযোগিতার ধরন

সহযোগিতর ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
বর্তমানে স্বামী সাহায্য করে	-	-
বর্তমানে স্বামী কোন সাহায্য সহযোগিতা করে না	৮৩	১০০
মোট	**৮৩**	**১০০**

৬. পরিত্যক্তা নারীদের সন্তান

গবেষিত পরিত্যক্তা মহিলাদের অধিকাংশেরই সন্তান সন্ততি আছে। সন্তানসহই তারা পরিত্যক্তা হয়েছেন। মোট ৮৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬১ জনেরই এক বা একাধিক সন্তান আছে। সর্বোচ্চ ৩টি সন্তান আছে দু-তিনজনের। সারনী ৪-এ সন্তান সন্ততিদের সংখ্যা তুলে ধরা হলো। অর্থাৎ স্বামীরা শুধুমাত্র তার স্ত্রীকেই পরিত্যক্তা করেনি একই সংগে তার সন্তানদেরও পরিত্যাগ করেছে।

সারনী ৪: পরিত্যক্তা নারীদের সন্তান সংখ্যা

সন্তান সন্ততি	সংখ্যা	শতকরা হার
১ জন	৩৯	২৭
২ জন	১৩	১১
৩ জন	১	২
মোট	**৫৩**	**৪০**

৭. ছেলেমেয়েদের বর্তমান আশ্রয়স্থল

মুসলিম আইনে বাবা হলেন সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক। মুসলিম আইনে মা সাত বৎসর পর্যন্ত ছেলে সন্তানকে ও বয়সন্ধিকাল পর্যন্ত মেয়ে সন্তানকে কাছে রাখতে পারেন, 'হিজানা' বা জিম্মাদারিত্ব পালন করতে পারেন, কিন্তু আইনগত অভিভাবক হতে পারেন না। সারনী ৫-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র ৫ জন সন্তান তারা বাবার কাছে এবং ২ জন সন্তান তার দাদা বাড়িতে প্রতিপালিত হচ্ছে। আর এর বাইরে পরিত্যক্তা মায়েরাই তাদের সন্তানকে মানুষ করে চলেছেন। আমরা জানি এ সকল পরিত্যক্তা নারীরা তাদের স্বামীর সংসার ত্যাগ করার সময় বা পরবর্তীতেও দেনমোহর বা কোন নগদ অর্থ অথবা নিজের এবং সন্তানদের জন্য কোন ধরণের সাহায্য সহযোগিতা পাননি। তারপরও মা হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। এদের অনেকেই জানেন না যে তারা নিজের সন্তানের আইনগত অভিভাবক নন।

সন্তানের ভরনপোষণের দায়িত্ব পালন না করে পুরুষ যে ভুল, অন্যায় বা অমানবিকতার পরিচয় দেয় নারী সে দায়িত্ব গ্রহণ করে ত্যাগ ও মানবিকতার পরিচয় দেয়। এই ত্যাগ পালন করতে গিয়ে মা হয়তো ঠকছেন, তার নিজের জীবন হয়তো নষ্ট হচ্ছে, তবুও সন্তানের দিকে চেয়ে সেটা তারামেনে নিচ্ছেন। বাবা দায়িত্ব নেননি বলে তারাও দায়িত্ব না নেবার মতো স্বার্থপর হতে পারেন না।

এ সকল পুরুষ স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করেননি এবং পিতা হিসেবে সন্তানের প্রতি দায়দায়িত্বকে অস্বীকার করেছে। সন্তানের ভরনপোষণের, লালনপালনের যাবতীয় দায়িত্ব যেন একা মায়ের। স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার না হতে পেরে, পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করতে না পেরে এই বিধবা নারীরা সন্তানসন্ততি সহ এক নিদারুণ দুঃখে দিন কাটান। আয়েশা বানু নারী প্রধান খানা ঃ দারিদ্র বনাম সচছলতা কতিপয় সূচক নির্ণয় প্রবন্ধে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, পরিত্যক্তা একাকী নারী পরিচালিত খানা সমূহকে নারী প্রধান খানা হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'এই ধরনের খানা প্রধান শুধুমাত্র নারী হবার কারণেই এমন কতগুলি বাধার সম্মুখীন হন যা তাকে আরো দারিদ্রের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক বিধি নিষেধ ও নিরাপত্তার খাতিরেই একজন নারীকে কাজ করতে হয় নিকটবর্তী কোনো এলাকায়। অথবা শিশু পালনের দায়িত্বের কারণে বেছে নিতে হয় কম মজুরির অনিয়মিত কাজ।' Widows and Other Women Heads of Household in Rural Bangladesh: Well being and Survival Strategies - M.A Mannan, BIDS তার গবেষণা গ্রন্থে পরিত্যক্তা, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের নাজুকতা তুলে ধরেছেন।তিনি বলেছেন 'প্রায়শই দেখা যায় সমর্থ পুত্রের অভাবে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত নারীদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে এবং তারা ন্যায্য জমি ও সম্পত্তি টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে পরাজিত হয়।' সারনী ৫-এ চিত্রটাই ফুটে উঠেছে।

সারনী ৫: পরিত্যক্তা নারী সন্তানদের বর্তমান আশ্রয়স্থল

বর্তমান আশ্রয়স্থল	ছেলে	মেয়ে
মায়ের কাছে	৪৬	৩৪
মায়ের বাবা মায়ের কাছে	৩	২
স্বামীর কাছে	২	৩
স্বামীর বাবা মায়ের কাছে	১	১
অন্যের বাড়ীতে থাকে	১	-
মোট	**৫৩**	**৪০**

আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারেই পুত্র সন্তানের জন্য বাবা-মা বা দাদা দাদীর একটা আকুতি থাকে। পুত্র সন্তান জন্ম দিতে না পারার কারণে অনেক পরিবার ভেঙ্গেও যায়। কিন্তু এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, পরিবার ভাঙ্গার জন্য কোন পুত্র সন্তান হওয়া বা না হওয়া কোন গুরুত্ব বহন করেনি। এটা আসলে পুরোটাই নির্ভর করেছে স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর, স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চাওয়া বা ছেড়ে দিতে চাওয়ার সিদ্ধান্তের ওপর। সন্তান উৎপাদনে সক্ষম বা পুত্র সন্তান উৎপাদনে সক্ষমতাই এখন প্রধান বিবেচ্য নয়।

৮. পরিত্যক্তা নারীদের বর্তমান আশ্রয়স্থল

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'গৃহ পরিচারিকা'বা এই জাতীয় কোন কাজে হিসেবে এমন নারীকে নিয়োজিত হতে দেখা যায় যিনি স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা বিধবা। আমাদের গবেষণায় অধিকাংশ স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে এ পেশাই বেছে নিতে দেখা গেছে। সন্তানসহ টিকে থাকার জন্য অনেকেই আবার ফিরে গেছেন বাবা-মায়ের কিংবা ভাইয়ের সংসারে। অর্থাৎ অনেক খরচ করে মেয়ে বা বোনকে বিয়ে দিয়ে বোঝা নামানোর জন্য তারা যত তৎপরই হোন না কেন বাস্তবে সেই বোঝা আরো দীর্ঘস্থায়ী হয়, সারা জীবনব্যাপী সেই মেয়ের বোঝা তাদেরকেই টেনে বেড়াতে হয়।

পরিত্যক্তা মহিলাদের একটি বিরাট অংশ যে গৃহভৃত্যের বা এ জাতীয় কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন । অধিকাংশ নারীকে যে কোনভাবেই হোক নিজেদের সংস্থান নিজেদেরই করতে হচ্ছে। বাবাভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেও নিজেদের খরচ কিছুটা পূরণের জন্য নানা ধরণের কাজে তাকে যুক্ত হতে হচ্ছে। জরিপকৃত পরিত্যক্তা মহিলাদের কয়েকজন বিভিন্ন পেশার সাথেও যুক্ত হচ্ছেন, তাদের সংখ্যা অবশ্য কম, মাত্র ১২.০%। মূলত: কর্মসংস্থানের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার অভাবে পরিত্যক্তা মহিলাদের অধিকাশংকেই পূণরায় বাবা ভাইয়ের আশ্রয়েই ফিরে আসতে হয়।

Widows and Other Women Heads of Household in Rural Bangladesh: Well being and Survival Strategies - M.A Mannan, BIDS গবেষণা গ্রন্থে বিধবা নারীদের সমাজের উপর নির্ভরতার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এই গবেষণায় পুরুষ প্রধান খানা এবং নারী প্রধান খানার অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নারীপ্রধান খানা বলতে বিধবা পরিত্যক্তা নারীপ্রধান খানাকে বুঝানো হয়েছে। 'বাসস্থান, সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতাই বিধবা নারীদের দুস্থতার সাথে বৃহৎভাবে সম্পর্কিত। এই সীমাবদ্ধতা বিধবা নারীর আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় এবং সমাজের সাহায্য সহানুভূতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সারনী ৬-এ পরিত্যক্তা নারীদের জীবন সংগ্রাম ফুটে উঠেছে।

সারনী ৬: পরিত্যক্তা নারীরা যেভাবে বেঁচে আছেন

আশ্রয়স্থল	সংখ্যা	শতকরা হার
অন্যের বাড়ী কাজ করছেন	৫২	৬২.৭
বাবার বাড়ী আছেন	৩৭	৪৪.৬
নিজে আয় করেন	১০	১২.০
ভাইয়ের বাড়ী আছেন	৯	১০.৯
মোট	১০৬*	১০০

নোট: উত্তরদাতাদের অনেকেই একত্রে দুটি উত্তর বলেছেন এদের অনেকেই নিজে কিছু আয় করলেও তারা মূলত বাবা বা ভাইয়ের আশ্রয়েই আছেন।

৯. স্বামীর এধরণের আচরণের পিছনের কারণ

উত্তরদাতা নারীদের পরিত্যক্তা হবার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ পরিত্যাগের ঘটনা স্বামীর একাধিক বিয়ের কারনে পরিত্যক্ত নারীদের অনেকে বলেছেন-'আমি জানতাম না' আমি আমার স্বামীর কয় নম্বর স্ত্রী। আমি বর্তমান থাকা অবস্থায় আমাকে না জানিয়ে এক নম্বর স্ত্রী হিসেবে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে । স্বামীর একাধিক বিয়ের কারণ হিসেবে পরিত্যক্তা এক নারী জানান,' বিয়ে করা আমার স্বামীর একটা পেশা।' দিনে দিনে বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুকের পরিমাণ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একাধিকবার বিবাহিতরাও যেখানে উপযুক্ত পাত্র হিসেবে গণ্য হচ্ছে সেখানে বিয়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ পেশা হিসেবে পরিণত হতে পারে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৬নং ধারায় বহুবিবাহ সংক্রান্ত বিধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই আইনে বলা হয়েছে, কোন লোক স্ত্রী বর্তমান অবস্থায় আরেকটি বিয়ে করতে চাইলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করবে। আবেদন পত্রের সাথে স্ত্রীর লিখিত অনুমতি থাকতে হবে।
বহুবিবাহের অনুমতি দেয়ার সময় সালিশী বোর্ড তিনটি বিষয় লক্ষ্য করবেন:

১. স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিতে ব্যর্থ হলে
২. স্ত্রী অসুস্থ কিংবা পঙ্গু হলে
২. স্ত্রীকে স্বামীর সংগে বসবাসে বাধ্য করা না গেলে।

বর্তমান গবেষণায় পরিত্যক্ত নারীদের প্রাথমিক তথ্যসূত্র থেকে বোঝা গেছে তাদের অধিকাংশই সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। সুস্থ্য এবং স্বামীর আশ্রয়ে তারা থাকতে চেয়েছিলেন। তাদের স্বামীরাই বর্তমান আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে আইনের জোরালো ভূমিকার অভাবে বিনা অপরাধে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেও সাজা ভোগ না করেই পার পেয়ে যাচ্ছে। পুনর্বিবাহের কারণে গবেষণাকৃত ৫০.৬১% নারীকে পরিত্যক্তা হতে হয়েছে। এভাবে একাধিক বিয়ের কারণে সংসারের ব্যয়ভার বহন কারী স্বামীদের জন্য স্ত্রীকে ব্যয়বহুল মনে হলে কোন না কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সেই ব্যয়ভার তারা কমাতে চায়। এভাবে কোন কারণ ছাড়াই বিনা দোষে স্ত্রীকে পরিত্যক্ত হতে হয়েছে।

পরিত্যক্তা এক নারী জানান, 'আমার প্রয়োজন আমার স্বামীর কাছে ফুরিয়ে গেছে। যদিও আমার স্বামী আম.কে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল কিন্তু নতুন বউ আনার পর হঠাৎ করে আমাকে অপছন্দ করা শুরু করল। তারপরও আমি আমার স্বামীকে ভালবেসে ঐ সতীনের সংসারে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্বামীর অনাগ্রহে তা সম্ভব হয়নি।' এরকম অধিকাংশ নারীকে নিজের সংসার করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বামীর অনাগ্রহে পরিত্যক্তা হতে হয়েছে।

কিছু কিছু পরিত্যাগের ঘটনার পিছনে কন্যার পিতামাতার যৌতুকের ক্ষুধা মিটানোর ব্যর্থতা কাজ করছে। জরিপকৃত পরিত্যক্তা মহিলাদের অধিকাংশই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পরপরই যৌতুকের টাকা পরিশোধ করেছিলো, কেউ কেউ পরিশোধ করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা হওয়ার সময় এ বিষয়গুলোও বিবেচনা করা হয়নি। স্ত্রীকে রাখবে না এ অজুহাতে স্ত্রীর পরিবারের কাছ থেকে আরো টাকা চেয়েছে টাকার পরিমাণটা এমন যাতে তারা সে দাবি মেটাতে না পারে। পরিত্যক্তা এক মহিলা জানালেন,' 'আমার স্বামী, আমার কাছে অনেক টাকা যৌতুক চায়, আমার বাপ-মায়ে আগে তো পুরো টাকাই দিছে আবার কই থেইকা টাকা দিবো?'

'যৌতুক নিরোধ আইন' ১৯৮০ এর ৪নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা বা অভিভাবকের কাছে যৌতুক দাবী করে তবে কমপক্ষে এক বছর এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, যৌতুক চাওয়ার অপরাধে ঐসব স্বামীকে কোন মামলার সম্মুখীনই হতে হয়নি কিন্তু ঐ নারীকে এক বা একাধিক সন্তানসহ ঘর হারাতে হয়েছে, পরিত্যক্ত হতে হয়েছে।

যৌতুকের লোভে যেখানে অধিকাংশ বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং যৌতুক যেখানে পেশা হিসাবে চিহ্নিত, সেখানে, বোঝাই যাচ্ছে, বিশাল এক অকর্মণ্য জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র এ যৌতুকের টাকার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে চাইছে। এ যৌতুকের টাকা ফুরিয়ে যাওয়া মানে ঐ বউয়ের প্রয়োজনও সেই সাথে ফুরিয়ে যাওয়া। সুতরাং নতুন বিয়ে করা ছাড়া ঐ অকর্মন্য পুরুষদের গত্যন্তর থাকে না। ৯.৬৪% নারী এ যৌতুকের কারণেই পরিত্যক্তা হয়েছেন। উল্লেখ্য যৌতুক এবং দ্বিতীয় বিবাহ একটির সাথে আরেকটি পরস্পর সম্পর্কিত।

এ প্রসঙ্গে বেলতৈল গ্রামের জরিমন জীবন গবেষনার আলেখার ঘটনা উল্লেখ করছি:

'জব্বার আলী আলেখাকে রাখবেন না এ উদ্দেশ্য নিয়েই যথেষ্ট অত্যাচার এবং মারধর করেন। ভাইয়েরা জব্বারকে বাধা দেন কিন্তু জব্বারের অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়।

আলেখা বাড়ী এসে মারধরের কথা সহজ বলতেন না, কারণ-'দুঃখ কষ্ট যতই হোক স্বামীর সংসার তো করতে হবে।' আলেখার কপাল মন্দ ছিল। রোজার ঈদের (১৯৭৯) ৩ দিন পূর্বে ভাদ্র মাস পালনের জন্য তার বাবা নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। এই আসাই হলো তার শেষ আসা। আলেখার ভাইয়েরা বহুবার জামাইকে আনতে গিয়েছেন। জব্বার আলী আসেনি। অবশেষে আলেখার বাপ জামাইকে আনার জন্য বেলতা যান। জব্বার শ্বশুরকে দেখা পর্যন্ত দেননি বরং পড়শী লোকের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন কথা শুনিয়ে অন্যত্র সড়ে পড়েছেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে তারা এসব সহ্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত জব্বার যখন পরিস্কার জানিয়ে দিলেন যে, 'আলেখাকে আর তারা ঘরে ফিরিয়ে নেবে না।' মাথার তাঁর আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তিনি জব্বারের আত্মীয় স্বজনের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাতে-পায়ে পর্যন্ত ধরেছেন ,কিন্তু তাঁর সমস্ত আবেদন- অনুরোধ বিফলে গেছে। জব্বার আলীকে কেউ কোন কথা শোনাতে পারেননি। শেষে একদিন কাবিল মন্ডলকে খবর দিতে জব্বার আলী যৌতুকের এগার'শ টাকাসহ আলেখার তালাকনামা তার হাতে দিয়ে দেন। বুক ফাটা কান্না চেপে মেয়ের সর্বনাশনামা তিনি বাড়ী নিয়ে আসেন।'

পৃষ্ঠা ১২৯, আলেখার মৃত্যু, বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যারা

তিলে তিলে সংসার গুছিয়ে নেয়ার পর শ্বশুরবাড়ীকে নিজের বাড়ীর মত আপন করে নেয়ার পর সংসারের প্রতিটি জায়গায় গৃহিনীপনা ফুটিয়ে তোলার পর ঐ সংসারের প্রতি নারীর তার যে টান আছে সেটা বোঝাই যায়। আর ঐ সংসারের ভালর জন্য যখন তার স্বামীকে মদ খেতে বা জুয়া খেলতে নিষেধ করা হয় তখনই ঐ নারীকে সংসারের ভাল চাওয়ার অপরাধে পরিত্যক্তা হতে হয় এরকম পরস্পর বিরোধী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নারীর অসহায়ত্বকে আরও স্পষ্ট করে। কোন নারী যখন বলে, 'স্বামীরে জুয়া খেলতে নিষেধ করছিলাম তাই খেদাইয়া দিছে।' অন্য আরএকজন পরিত্যক্তা নারী বললেন, 'স্বামী জুয়া খেলে। সংসার চলে না। পোলাপানের খাওয়া-পড়ন নাই। যা আয় করে তার সবই জুয়া খেইলা নষ্ট করে। এর প্রতিবাদ করছিলাম । ভাগ্যে জুটছে পরিত্যক্তার কালি' ২০.৯৯% পরিত্যাগের ঘটনার পিছনে এ ধরনের কারণই দায়ী। পরিত্যক্তা নারীরা যে যে কারণে পরিত্যক্তা হয়েছেন সারনী ৭-এ সে ধরনকে তুলে ধরা হয়েছে।

সারনী ৭: স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হবার কারন

পরিত্যাগ করার কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার
দ্বিতীয় বিবাহ করার কারনে	৪২	৫০.৬১
স্বামী মারপিট করতো/ মদ জুয়া খেলতো	১৭	২০.৯৯
স্বামীর কোন খোঁজ খবর নাই	৯	১০.৮৪
যৌতুকের টাকা না দেওয়ার কারণে	৮	৯.৬৪
প্রথম স্ত্রীর কাছে চলে গেছে	৫	৬.০২
স্বামী পাগল	২	২.৪০
মোট	৮৩	১০০

১০. পরিত্যক্তা নারীরা স্বামীদের এ ধরনের অপরাধে যে ধরনের বিচার চান

স্বামীদের এ ধরনের আচরণে পরিত্যক্তা নারীদের ক্ষোভ অনেক। তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়েছেন, 'তাদের সাথে এ ধরনের অন্যায় আচরণ করার জন্য স্বামীদের কঠিন শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এক পরিত্যক্তা নারী বললেন, তার স্বামীকে জেলের ভাত খাওয়ানো উচিত। যাতে ভবিষ্যতে তারা এ ধরনের ঘটনা আর ঘটাতে সাহস না পায়।' পরিত্যক্ত নারীরা বলেছেন, পরিত্যক্তা হওয়ার কারণে তাদের জীবন পাল্টে এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। গায়ে পরিত্যাক্তর কালি লাগার কারনে সমাজ সংসারে তারা উচ্ছিষ্ট হিসেবে বেঁচে আছেন। তারা বলেছেন, এই জীবনের চাইতে বিয়ে না হওয়া অনেক ভাল ছিল। পরিত্যক্ত নারীদের কেউ কেউ বলেছেন, এই রকম অসৎ চরিত্রের পুরুষদের এমন শাস্তি দেওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোন পুরুষ তার ঘরের স্ত্রীকে বিনা অপরাধে পরিত্যগ করার সাহস না পায়। অনেক পরিত্যক্তা নারী জানিয়েছেন, এ ধরনের খারাপ মানুষকে সারাজীবনই জেলে 'বাইন্ধা' রাখা উচিত যাতে তারা আবারও বিয়ে করতে না পারে।

এ সবই তাদের কষ্টের কথা, আক্ষেপের কথা। মূলতঃ তারা তাদের স্বামীদের এ ধরনের আচরণের জন্য আইনগত সুষ্ঠু ব্যবস্থা পাওয়ার প্রত্যাশী। ৭৮.৩% নারীই এধরণের ঘটনায় আইনের হস্তক্ষেপ চান। বহুবিবাহের জন্য মামলা করার কথা বলেছেন ১৪.৫% নারী। ৭.২% নারী জানেনই না এ ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে তাদের কি করা উচিত। পরিত্যক্তা নারীদের ক্ষোভের ভাষা সারনী ৮-এ ফুটে উঠেছে।

সারনী ৮: পরিত্যক্তা নারীরা যে বিচার চান তার ধরন

ব্যবস্থার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
আইনের সাহায্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন	৬৫	৭৮.৩
বহু বিহাহের জন্য মামলা	১২	১৪.৫
জানি না	৬	৭.২

১১. যাদের কাছে প্রতিকার চেয়েছিলেন

পরিত্যক্ত হওয়ার পর ৭৩.৫% নারীই এ ধরনের ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিকার চেয়েছিলেন। স্বামীর সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য তারা চেয়ারম্যান, গ্রামের অর্থশালী/ বিত্তশালী লোকদের কাছে, এমনকি স্বামী শ্বশুরের কাছেও গিয়েছিলেন। তাদের হাত-পা ধরে এ অন্যায়কে ঠেকাতে চেয়েছিলেন। এদের কেউ কেউ তাদের কথা মন দিয়ে শুনেছিলেন, সমস্যর সমাধান করে দিবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু এদের কেউই শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্তা নারীদের কোন সমাধানের পথ বাতলে দিতে পারেননি। পরিত্যক্তা নারীদের মধ্যে কারা বিচার চেয়েছিলেন সারনী ৮-এ তার সংখ্যা দেওয়া হলো।

সারনী ৮: পরিত্যক্তা অবস্থায় যারা এ ঘটনার জন্য বিচার চেয়েছিলেন

বিচার চেয়েছিলেন	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬১	৭৩.৫
না	২২	২৬.৫
মোট	৮৩	১০০

পরিত্যক্তা নারীরা জীবনের এ অসহায় মুহূর্তে যাদের কাছে সাহায্যের আশায় ছুটে গিয়েছিলেন সারনী ৯-এ তার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারনী ৯: পরিত্যক্তা হয়ে যাদের কাছে সহায়তার জন্য গিয়েছিলেন

যাদের কাছে বিচার চেয়েছিলেন	সংখ্যা	শতকরা হার
অর্থশালী/ প্রভাবশালী ব্যক্তি	২৮	২৩.২৪
চেয়ারম্যান	২৬	২১.৫৮
মেম্বার	১৮	১৪.৯৪
ছেলের বাবা মা	১৪	১১.৬২
নিজের বাবা মা	১	০.৮৩
নাগরিক উদ্যোগ	১	০.৮৩
	৮৮*	১০০

(পরিত্যক্তা নারীরা প্রতিকার চেয়ে একাধিক জনের কাছে গিয়েছিলেন।)

দেখা গেছে বিভিন্ন মাধ্যমে এই পরিত্যাক্তা নারীরা সুবিচার আশা করলেও তা তাদের নাগালের বাইরে থেকে গেছে। তারা সুবিচার বলতে বুঝিয়েছিলেন বিনা অপরাধে পরিত্যক্তা হওয়া থেকে বাঁচতে পারা। সুবিচার বলতে বুঝিয়েছিলেন, স্বামীর যত অন্যায়ই থাকুক না কেন সেই স্বামীর সাথেই যাতে তারা সংসার করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া, অসহায় সন্তানদের পিতৃ পরিচয় অব্যাহত রাখা, তারা স্বামীর সংসারে আছেন এই পরিচয়ে বাঁচতে চাওয়া।

১২. উপসংহার

এই গবেষণা থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি, আমাদের সমাজে পরিত্যক্তা নারীদের জায়গা তাদের বাপ বা ভাইদের সংসারে আশ্রিতা হিসেবে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দু'একজন লেখাপড়া জানা এবং একটু সাহসী নারী হয়তো পরিত্যক্তা হবার পর ছোটখাট কোনো পেশায় ঢুকতে পেরেছেন, কিন্তু স্রেফ 'পরিত্যক্তা' পরিচয়টা থাকার কারনেই তারা পেশাজীবী হলেও মর্যাদা নিয়ে সমাজে স্থান পাচ্ছেন না ।

বিধবা মহিলাদেরকে আমাদের সমাজে তবু কিছুটা সহানুভূতির চোখে দেখা হয, আবার তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা অনেকক্ষেত্রে (সব ক্ষেত্রে নয়) দেনমোহর ইত্যাদি নগদ অর্থ হাতে পেয়ে থাকেন যার দ্বারা কোনো একটা কাজ বা সংস্থান তারা জুটিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু পরিত্যক্তা মহিলাদের অবস্থা প্রকৃত অর্থেই শোচনীয়।

এই গবেষণা থেকে আরেকটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে সামনে এসেছে সেটা হলো স্ত্রী কে তালাক দিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই আইনি ঝামেলা বা অন্তত পক্ষে সামাজিক সালিশে জড়াতে হয়। এবং সেসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই স্বামী কে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতে হয়, সম্পত্তির ভাগ দিতে হয়, সন্তান সন্ততির দায়িত্ব নিতে হয়। কিন্ত পরিত্যাগ করলে অর্থাৎ যৌতুক আনার নাম করে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে আর না আনলে, অন্যত্র বিয়ে করে বা চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গিয়ে আর কোনো খোঁজ খবর না নিতে কোনো মীমাংসার দরকার হয়না, দেনমোহর দিতে হয়না। এসব 'সুবিধার'কারনেই হয়তো অনেকে তালাকের দিকে না গিয়ে স্থায়ী পরিত্যাগের পথ বেছে নেয়।

গবেষনা থেকে আমরা দেখেছি, এই নারীরা বা তাদের সন্তানেরা শেষ পর্যন্ত না পায় পিতা বা ভাইয়ের সম্পত্তির ভাগ, না পায় পিতা বা ভাইয়ের সম্পত্তিতে সামান্য অংশিদার। এরা অনেকটা ভাসমান তৃণের মতো জীবনের বাকী অংশ কাটিয়ে দেন। সন্তান সন্ততিকে যতটা পারা যায় জীবনের দৌড়ে জুড়ে দিয়ে নিজের জীবন থেকে অবসর নেয়াই এদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই তাদের চাওয়া পাওয়ার ইতিহাস।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, সম্পাদনা বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর জরিনা রহমান খান, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র

বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা, সম্পাদনা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস, গ্রামীন ব্যাংক, মীরপুর

নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সম্পাদনা মেঘনা গুহঠাকুরতা সুরইয়া বেগম হাসিনা আহমেদ,সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র

আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ: সম্পাদনা: সুলতানা কামাল আইন ও সালিশ কেন্দ্র

আইনের কথা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

M.A. MANNAN, BIDS, Widows And other Women Heads of Household In Rural Bangladesh: Well-Being And Survival Strategies